International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-I, February 2017, Page No. 17-28
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চা: একটি পর্যালোচনা

তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, এস. ভি. এস. জি. সি. (ইউ. জি. সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড.সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Numerous terracotta temples are situated in different places of Bengal. In the undivided region of Bengal the terracotta temple architecture is of its own class and full of verities. It is historically and culturally significant. On the basis of history, archaeology and folklore terracotta temple architecture of this region has plentiful significance and importance. These temples were not only built by compete zeal of individuals artisans for performance of religious duties but also a significant example of cultivation of art. This style of architecture present gleams customs and culture of Bengal to us. Particularly terracotta plaques fixed on temples comprise valuable elements for reconstructing the mythological and socio-cultural heritage. The themes of the terracotta plaques are mainly based on the stories of Ramayana, Mahabharata and myths. Incredible architectural and decorative skills can be traced through the terracotta temples of Bengal. Architectural style and designing style of the temples of this region reveal the profundity of the artisan. Moreover, the temple architecture of Bengal reveals a rich heritage of Bengal architecture. At present most of the temples' condition are in worst situation. Some of the famous temples are being *conserved, but most of the temples are in a ruined state. In proper manner and in a scientific way these temples must be conserved to retain the heritage of Bengal and today it needs some in-depth research work for conserving the terracotta architecture? It is our duty to preserve our cultural heritage and inform the people about the gist of the terracotta temples. Many tourists, archeologists, researchers had visited to these nicely decorated architectural terracotta temples. Since inception of the twenty century many national and foreign scholars did research work on the terracotta temple architecture of Bengal. A lot of articles, research papers, books and monographs have been published on this subject. Mostly it has been studied description rather than analysis of the architecture of terracotta temples. The present paper has assessed briefly the history of the study of terracotta temple architecture of Bengal.*

Keyword: Temple, Terracotta, Architecture, Archeology, Folklore, Culture, Heritage

১. ভূমিকা: ভারতীয় শিল্প-কলার ঐতিহ্যে মন্দির-স্থাপত্য যথেষ্ট গৌরবময়। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে এই মন্দির-স্থাপত্যের যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। মন্দির-স্থাপত্য শৈলীর বিভিন্ন ধারার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য। মাটিকে পুড়িয়ে টেরাকোটা ফলক নির্মাণ করে এই ধরনের মন্দির তৈরি হয়। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসাবে মন্দিরগুলি তৈরি হয়নি, এগুলি ছিল দক্ষ শিল্পীদের শিল্পচর্চার সার্থক উদাহরণ। এইসব স্থাপত্য রীতি বাঙালি সংস্কৃতির এক উন্নত আলোকোদ্ভাসিত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করে। এই টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি থেকে আমারা তৎকালীন সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। এই মন্দির-স্থাপত্যগুলি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। বাংলায় যে অসংখ্য টেরাকোটার মন্দির রয়েছে সেগুলি আস্তে আস্তে ধংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের উচিত সেগুলিকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এগুলির তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা। বাংলার এই অপূর্ব ও সুসজ্জিতমণ্ডিত টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য দেখতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে নানান দেশী বিদেশী গবেষক, পুরাতত্ত্ববিদ ও পর্যটকেরা এসেছেন।

বাংলার নানা প্রান্তে, শহর, মফস্বল ও গ্রামের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র মন্দির-স্থাপত্য। কালের প্রকোপে ও সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবে এই অমূল্য সম্পদগুলি আজ ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে এবং অনেক মন্দির ইতিমধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে আশার কথা এই যে বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গবেষক ও পন্ডিতেরা নানান গবেষণামূলক কাজ সংগঠিত করেছেন। তাঁরা টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত নানান মূল্যবান গ্রন্থ এই বাংলার মানুষকে উপহার দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল: কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ, প্লানিং কমিশন, গ্লোবাল হেরিটেজ ফান্ড, বিড়লা স্ট্রাষ্ট প্রভৃতি। আর বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে যেসব গবেষকরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নির্মল কুমার বোসু, ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, মোহিত রায়, জুলেখা হক, তারাপদ সাঁতরা, প্রণব রায় প্রমুখ। বাংলায় যে সব নানান রীতির মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায় সেগুলি বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে পঠন-পাঠন ও গবেষণার বিষয় হিসাবেও এই টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি সমকালীন সময়ের বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐশ্বর্য, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতি সব কিছুরই সাক্ষী বহন করে নিয়ে চলেছে। মন্দির হল স্থায়ী উৎসর্গের নির্দশন স্থল। তাই প্রভাবশালী জমিদার থেকে রাজণ্যবর্গ পুণ্য অর্জন বা পূর্বপূরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করে তাদের আরাধ্য দেব-দেবীকে উৎসর্গ করতেন। আমাদের এই বাংলাদেশ শস্য-শ্যামল, পলিমাটি দ্বারা আবৃত। তাই মাটির সহজলোভ্যতার জন্য বাংলায় পাথরের তুলনায় ইঁটের মন্দির বেশি তৈরি হয়েছে। আর এই ইটেঁর তৈরি মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, লৌকিক প্রভৃতি ঘটনার ফলক বসিয়ে মন্দিরগুলিকে আরো সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দনকারী করে গড়ে তুলেছেন সেকালের শিল্পী ও কারিগরেরা।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। বিগত শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতেরা নানা গবেষণার কাজ করেছেন। সেই সূত্র ধরেই এ-বিষয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সময়কালেও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে চর্চার মাধ্যমে গবেষকদের লেখনীতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মন্দির-স্থাপত্যের নানা দিক অলোচিত হয়েছে, যেমন- গঠন রীতি, শৈলী, অলংকরণ প্রভৃতি। মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ে বিবরণধর্মী চর্চার মাত্রা বেশী, বিশ্লেষণের তুলনায়। তবে বিশ্লষণধর্মী চর্চা যে একেবারেই হয়নি তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত ও

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত চর্চার রূপরেখাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

২. বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ঐতিহ্য: প্রাক-চৈতন্য যুগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে টেরাকোটার অসংখ্য মন্দির তৈরি হয়েছিল স্থাপত্যগত বৈচিত্র্য ও শিল্পচর্চায় সেগুলির গুরূত্ব কম নয়। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসাবে মন্দিরগুলি তৈরি হয়নি, এগুলি ছিল দক্ষ শিল্পীদের শিল্পচর্চার সার্থক উদাহরণ। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলন বা সমন্বয় বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের রীতি ও শৈলীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ও উত্তর পূর্বাংশে প্রাচীন রাঢ়ীয় সংস্কৃতি, দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ওড়িশার আওতায় দীর্ঘকাল থাকার ফলে এই অঞ্চলে ওড়িশী সংস্কৃতি এবং পশ্চিমাংশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত থাকায় আদিবাসী সংস্কৃতির ভাবনার স্রোত এই অঞ্চলগুলিতে বয়ে গেছে। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যে খাঁটি ওড়িশী রীতির প্রভাব অনেকক্ষেত্রে চোখে পড়ে।

পশ্চিমবাংলায় রেখা, চালা, মঞ্চ, রত্ন, সমতল ছাদ প্রভৃতি রীতির মন্দির-স্থাপত্য আমাদের চোখে পড়ে। অভ্রভেদী শিখর বা বাংলার খড়ের ঘরের অনুকরণে খর্বাকৃতি চালা রূপের বহু বিচিত্র ভঙ্গিমা, মন্দিরগুলির গায়ে পোড়া মাটির সুন্দর সুন্দর মূর্তি, যা আজও বিস্ময় হয়ে রয়েছে। এগুলি কতকাল আগে তা আমাদের দেশীয় কারিগরদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল-- যা সম্পর্কে আজও আমরা অজ্ঞ হয়ে রয়েছি। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসাবেই নয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরগুলি থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মৌলিক উপাদান সংগৃহীত হতে পারে। এ- সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই কম। মন্দিরগুলি তাই ধর্মচর্চার জন্য ধনী জমিদারদের ঐশ্বর্যছটার বিলাস নয়, এতে ধনীর বিলাসের থেকে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়। আর মন্দির-স্থপতিদের জীবিকার উপায় উত্তরকালের সর্বক্ষয়ী সমাজের হতাশা বিড়ম্বিত জীবনের ক্ষণিক আনন্দের প্রকাশ। তাই অন্যান্য পুরাবস্তুর তুলনায় আমাদের এই মন্দিরগুলির বয়স খুব বেশি না হলেও অন্তত চার পাঁচশ বছর আগের সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস এই শেষ মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলি থেকে সংগৃহীত হতে পারে, যার গুরূত্ব দেশের সামগ্রিক ইতিহাসের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

পশ্চিমবাংলার মন্দিরগুলিকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: চালা, রত্ন, দেউল এবং চাঁদনি দালান। চালার মধ্যে একটিমাত্র চালযুক্তকে ‘একচাল’ বা ‘একচালা’, দুটি চাল বা ‘দোচালা’, যাকে একবাংলাও বলা হয়। আবার দুটি দোচালাকে সামনে পিছনে যুক্ত করে হয় জোড়বাংলা। এরপর চারদিকে চারটি চাল সংযুক্ত করে হয় ‘চারচালা’-এমনকি ‘বারচালা’ পর্যন্ত মন্দির দেখা যায়। এই‘চালা’ মন্দিরের ধারণাটি এসেছিল বাঙালির অতি পরিচিত খড়ের চালা ঘর থেকে। ‘চালা’ মন্দিরের সঙ্গে ‘চাঁদনি’, ‘দালান’ প্রভৃতি শৈলীর মন্দিরের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ‘চাঁদনি’ ও ‘দালানের’ ছাদ সমতল, কিন্তু চালার চাল ঢালু। চাঁদনির ক্ষেত্রে দালানের পার্থক্য স্পষ্ট আয়তনের দিক থেকে। আবার এক হলেও আয়তন হয়েছে বিশাল এবং রয়েছে অনেকগুলি প্রবেশ পথ। উল্লেখ করা যেতে পারে চালা, চাঁদনি ও দালানের মধ্যে সরল সাদামাটা স্থাপত্য চিন্তাই বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য রীতি। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলায় এই রীতির বাসগৃহ তৈরি হয়ে এসেছে। রত্ন শৈলীর মন্দিরের মধ্যে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রত্ন শৈলীর মন্দিরের মধ্যে বাংলার চালা, চাঁদনী বা দালানের ছাদে ছোট আকারের দেউলকে চূড়া বা রত্ন রূপে বসিয়ে নতুন আলাদা এক শৈলী বা রীতি সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু চূড়া বা রত্ন বসাবার একটা শৃঙ্খলা ছিল। এর ফলে উদ্ভব হল এই রত্ন স্থাপত্যেরই কয়েকটি শ্রেণি, যেমন- ‘একরত্ন’, ‘পঞ্চরত্ন’, ‘নবরত্ন’, ‘ত্রয়োদশরত্ন’, ‘সপ্তদশরত্ন’, ‘একবিংশতিরত্ন’ ও ‘পঞ্চবিংশতিরত্ন’। সর্বোচ্চ চারটি তলেই পঁচিশটি চূড়া বসানো হতো। ‘দেউল’ রীতির যে অজস্র মন্দির দেখা যায়, সেগুলি প্রাচীন ‘রেখা’ ও ‘শিখর’ দেউলের রূপান্তরিত ও সরলীকৃত অপেক্ষায় ক্ষুদ্রায়তন দেউল মন্দির, যা গ্রাম গঞ্জের সর্বত্রই আমাদের চোখে পড়ে। [১]

নদীমাতৃক বাংলার পলিমাটিতে গড়া অঞ্চলগুলিতে ইঁটের মন্দির ও তার টেরাকোটার অলংকরণ অনন্য। বিশেষ করে বাংলার মধ্যে রাঢ় বাংলার এই টেরাকোটা কারুকার্যখচিত মন্দিরের সংখ্যা সর্বাধিক। তাই রাঢ় বাংলাকে ‘মন্দিরের হৃদয়ভূমি’ বলা হয়। এইসব মন্দির-স্থাপত্যগুলি বাঙালি সংস্কৃতির এক উন্নত আলোকাভাসিত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করে। ইঁটের মন্দিরগুলিতে বহুক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনি এবং সাধারণ মানুষের জীবনধারার যে জ্বলন্ত ছবি রূপায়িত হয়েছে তার ফলে টেরাকোটা মন্দিরগুলির মধ্যে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের আর্বিভাবের কিছুকালের মধ্যেই এই শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে, যাকে কেউ কেউ লোকায়ত শিল্প বলে মনে করেন। মূর্তিফলকগুলিতে গ্রামীণ সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, যেমন সাজ তেমনই মূর্তিগুলির বেশভূষা ও আকারে রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বিচিত্র প্রকাশ।[২]
বাংলার ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি অনন্য ও গৌরবময়। মন্দির-স্থাপত্যের গঠন-রীতি, স্থাপত্য শৈলী ও অলংকরণের অসাধারণ নৈপূণ্য এখানকার মন্দিরগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেহেতু বাংলায় টেরাকোটা মন্দিরের সংখ্যা সর্বাধিক এবং পাথরের মন্দিরের সংখ্যা সেতুলনায় নগণ্য, সেজন্য নদীমাতৃক এই বাংলায় পলিমাটিতে গড়া অঞ্চলগুলিতে টেরাকোটার অলংকরণ অনন্যতার দাবী রাখে। নিতান্ত অনাদৃত ও অবহেলিত বঙ্গসংস্কৃতির এই অমূল্য নিদর্শনগুলি বহু বিদেশী পর্যটক ও গবেষকদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও এদেশীয়দের কাছে তা নিতান্তই অবহেলা ও অবজ্ঞার বিষয় বলে মনে হত। তবে এখন এ-বিষয়ে সচেতনতা পূর্বের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চায় দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের অবদান: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলার টেরাকোটা মন্দির চর্চার ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। নানা কারণে বহু দেশী বিদেশী পর্যটক, গবেষক, পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিকরা এই বাংলার এসেছেন এবং বাংলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সুন্দর সুন্দর টেরাকোটার মন্দিরগুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং এ সম্পর্কে নানা তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। ডেভিড ম্যাককাচ্চন, মুকুল দে, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, প্রদোষ দাসগুপ্ত, সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁরাপদ সাঁতরা, প্রণব রায়, সইফুদ্দিন চৌধুরী, নীহার ঘোষ প্রমুখ ব্যাক্তিরা নানান আলোচনা করেছেন। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে যে সব বিদেশী পর্যটক, শিল্পী, সার্ভেয়ার, জেলা অফিসার প্রাভৃতিরা বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন হলেন: ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন, মন্টগোমারি মার্টিন, আলেকজান্ডার কানিংহোম, জে.ডি.এম. বেগলার, এ.সি.এল.কার্লাইল জেমস ফার্গুসন, জর্জ মিশেল, রাধেশচন্দ্র শেঠ, অশ্বিনীকুমার সেন, গুরুদাস সরকার, রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৮০৭-১৮১১ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নির্দেশে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন বাংলা-বিহার-অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে দেখে তার বিবরণ সহ একটি রিপোর্ট ১৮১৬ সালে জমা দেন। এই রিপোর্টে দিনাজপুরের মন্দির-ভাস্কর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। এরপর ১৮৭১ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে ডিরেক্টর জেনারেল অলেকজান্ডার কানিংহাম এবং তার দুই সহকারী বেগলার ও কার্লাইল বাংলার নানা প্রত্নস্থল যেমন: বাঁকুড়া, রানিগঞ্জ, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি স্থান ঘুরে ১৮৭২-৭৩ সালে একটি রিপোর্ট জমা দেন। এই রিপোর্টে বিষ্ণুপুরের মন্দির সম্পর্কে একটি আলোচনা রয়েছে। ১৮৭৫-১৮৭৭ সালে উইলসন হান্টারের A Statistical Accounts of Bengal শীর্ষক গ্রন্থেও বাংলার মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। এরপর গুরুসদয় দত্ত ১৯৩০ সাল থেকে তাঁর একের পর এক লেখায় বাংলার মন্দির-টেরাকোটার বিস্ময়কর শিল্পকৃতির কথা প্রচার করতে থাকেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুরুসদয় দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় বাংলার বিভিন্ন মন্দির ও মসজিদের টেরাকোটার ফলক সংগ্রহ করতে থাকেন। এরপর ১৯১১ সালে সংগৃহীত ফলকের ওপর ক্যাটালগ তৈরি করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বিস্তারিতভাবে ফলক সহযোগে ক্যাটালগিং করেন ১৯২২ সালে। এতে রামায়ণের কাহিনি কৃষ্ণলীলার কাহিনী প্রভৃতি স্থান পেয়েছিল। বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চা

নিয়ে এইসব ব্যাক্তিবর্গরা নানান গ্রন্থ, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ করেছেন।[৩] এই গ্রন্থগুলি কোনটা বা অঞ্চলকেন্দ্রিক, আবার কোনটা বিষয় কেন্দ্রিক, আবার কোন গ্রন্থে পুরাতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্দির-স্থাপত্যের আলোচনার দিকটি উঠে এসেছে। এবারে পর্যালোচনা করা হবে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের, যার মাধ্যমে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের চর্চার গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

Indian Temple Designs: স্বাধীনতার পরবর্তীকলে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন নির্মল কুমার বোসু। এই গ্রন্থটিতে রয়েছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের নকশা, ম্যাপ, আক্ষরিক অর্থ, ভারতের বিভিন্ন ধরনের মন্দিরের গঠন শৈলী এবং নানান মন্দিরের নকশাসহ রেখাচিত্র। এছাড়া ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কোন কোন রীতির মন্দির-স্থাপত্য রয়েছে তার সামগ্রিক আলোচনা। এই গ্রন্থটির মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে মন্দির-স্থাপত্যের নানান দিক, যেমন মন্দির-স্থাপত্য আলোচনার আক্ষরিক অর্থ, নক্‌শা, মন্দিরকে পরিমাপের বিভিন্ন দিক এবং তার , নক্‌শাসহ রেখাচিত্র প্রভৃতি বিষয়।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য পর্যালোচনায় সত্যিই এ গ্রন্থের অবদান উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে মন্দির-স্থাপত্যের গঠন শৈলীর যেসব, নক্‌শা ও রেখাচিত্র রয়েছে তা সহজেই বোধগম্য হয় এবং তা যথোপযুক্ত। গ্রন্থটির নাম Indian Temple Designs হলেও ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের মন্দির-স্থাপত্য প্রসঙ্গে কিন্তু আলোচনা করা হয়নি। এই গ্রন্থটি ইংরেজী গ্রন্থ হলেও গ্রন্থটিতে মাঝে মাঝেই লেখক অনেক মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত বাংলা পরিভাষা সরাসরি ব্যবহার করেছেন।

Late Mediaeval Temple of Bengal: বাংলার মন্দির-স্থাপত্য সংক্রান্ত বিষয়ে চর্চা করতে গেলে যাঁর নাম সর্বপ্রথমে আসে তিনি হলেন ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন। তাঁর রচিত এই Late Mediaeval Temple of Bengal শীর্ষক গ্রন্থটি মন্দির-স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে একটি আকর গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। এই গ্রন্থটি প্রথম রচিত হয় ১৯৭২ সালে এবং গ্রন্থটির পুণর্মুদ্রণ এশিয়াটিক সোসাইটি করে ১৯৯২ সালে। এই গ্রন্থটিতে মূলত রয়েছে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের শৈলীর বর্ণনা। এছাড়াও রয়েছে ভারতবর্ষের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সামগ্রিক পর্যালোচন ও তার বর্ণনা এবং পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলার কোন কোন ধরনের টেরাকোটা মন্দির দেখা তার সামগ্রিক আলোচনা ও দৃষ্টান্ত। বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের গঠন শৈলী সম্পর্কে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য।

বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের গঠন-রীতি নিয়ে এতো বিপুল ও সার্বিকভাবে আলোচনা এর আগে কোন লেখকের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বাংলার মন্দিরের গঠন-রীতির শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। এছাড়া কোন জেলায় কোন রীতির মন্দির-স্থাপত্য রয়েছে তার তালিকা ও শ্রেণিকরণের দিকটিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তবে গ্রন্থটিতে মন্দির-স্থাপত্যের আক্ষরিক অর্থ নিয়ে কোনরকম আলোচনা করা হয়নি এবং মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণশৈলী ও ফলকের বিষয়বস্তুর আলোচনাও খুবই সংক্ষিপ্ত।

Temple Terracotta of Bengal: প্রদোষ দাসগুপ্ত রচিত এই গ্রন্থটি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে রয়েছে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের গঠন শৈলী, মন্দির-স্থাপত্যে পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক প্রভৃতি কহিনী এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় কোন কোন ধরনের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য রয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়েও নানান পর্যালোচনা রয়েছে। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের রীতি, শৈলী, অলংকরণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির গুরূত্ব অপরিসীম। বাংলার বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে বিভিন্ন ধরনের ঘটনার টেরাকোটার যে দৃশ্যফলকগুলি সম্পর্কে লেখক যে ধরণের আলোচনা করেছেন তাতে গ্রন্থটির গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলার মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত আলোচনায়ও যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ। কিন্তু

এইসব বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক মন্দির-স্থাপত্যের গঠন শৈলীর আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম করেছেন।

Temple to Love Architecture and Devotion in Seventeenth Century Bengal: এই গ্রন্থটি পিকা ঘোষ ২০০৫ সালে Indiana University থেকে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে মূলত আলোচিত হয়েছে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে। এছাড়া রয়েছে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের রীতি ও বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা ও মাকড়া পাথরের মন্দির-স্থাপত্যের রীতির আলোচনা। এছাড়া রয়েছে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির গায়ে প্রতিস্থাপিত বিভিন্ন ধরনের ফলক নিয়ে পর্যালোচনা। মুঘল যুগ, সুলতালী যুগ, ব্রিটিশ যুগ ইত্যাদি যুগের মন্দির-স্থাপত্য চর্চার বর্ণনা। এছাড়া রয়েছে মন্দিরের রেখাচিত্র, নকশা ও চিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা এবং পরিশেষে রয়েছে মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের সূচি এবং পর্যালোচনা।

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা: এই গ্রন্থটি ১৪১৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয় এবং এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যক্‌কাচ্চন, তারাপদ সাঁতরা, মোহিত রায়, জুলেখা হক, হিতেশরঞ্জন সান্যাল প্রভৃতি লেখকের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে। বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চার করার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের অবদান কোন অংশেই কম নয়। এই গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখেছেন ইন্দ্রজিৎ চৌধুরি। এখানে তিনি বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে যেসব দেশী বিদেশী পন্ডিতেরা চর্চা করেছেন সেই নিয়ে বেশ তথ্য সমৃদ্ধ পর্যালোচনা ও মতামত প্রকাশ করেছেন। টেরাকোটা কাজের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলেছেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। পোড়ামাটির নানান মন্দির এবং মন্দিরের রীতি এবং মন্দির গাত্রে রামায়ণের কাহিনী প্রসঙ্গে ডেভিড ম্যক্‌কাচ্চন বেশ তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। হিতেশরঞ্জন সান্যাল বাংলার বিভিন্ন স্থানের মন্দির মসজিদের অলংকরণ ও তার শৈলী নিজস্ব যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। মধ্যযুগের সামাজ-সংস্কৃতির যে নানান প্রতিফলন তৎকালীন টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে ফুটে উঠেছিল সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁরাপদ সাঁতরা। এছাড়া তাঁরাপদ সাঁতরা মন্দির টেরাকোটায় প্রতীকী নিদর্শন সম্পর্কিত এবং বাংলার মন্দিরে রামায়ণ, রাসলীলা ও চৈতন্যলীলার দৃশ্য ফলক প্রসঙ্গেও পর্যালোচনা করেছেন। জুলেখা হক লিখেছেন বাংলার মন্দির টেরাকোটায় বিভিন্ন ইউরোপীয়দের অর্বিভাব প্রসঙ্গে। বাংলার মন্দির টেরাকোটায় বিভিন্ন পঞ্চের অলংকরণ সম্পর্কিত আলোচনা করেছন তাঁরাপদ সাঁতরা। মোহিত রায় বাংলার জেলা ভিত্তিক মন্দির টেরাকোটায় দুর্গার অবস্থান প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন, যা সত্যিই অসাধারণ।

বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (অন্ত মধ্যযুগ): নীহার ঘোষ লিখিত Temple Art of Medieval Bengal শীর্ষক গ্রন্থটির বাংলা ভাষান্তর করেন শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী ২০১২ সালে। এই গ্রন্থে রয়েছে সামাজিক সংস্কৃতিক অধ্যায়ের বিভিন্ন দিক ও পটভূমিকা, সামাজিক শৃঙ্খলতা পরিবর্তনশীলতা বনাম শিল্পের প্রগতি ও অবক্ষয়, গ্রামীণ সমাজের সংগঠন ও পরিবর্তন, ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রেক্ষিত, অন্তমধ্যযুগের মন্দির-স্থাপত্যের উন্নতিকাল, বিস্তৃতি ও সংকচন পর্ব, সমাজ সচেতনতার প্রতিভুরূপে বঙ্গীয় বৈষ্ণব মতবাদের উদ্ভব এবং তার যুক্তি বিচার, শিল্প বিষয় ভাবনা প্রসঙ্গে ধর্ম চিন্তা, পূজা পদ্ধতি ও বিশ্বাস। টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে কৃষ্ণ উপাখ্যান, চৈতন্য কাহিনি, বিষ্ণুর কাহিনি, মঙ্গল কাব্যের দেবদেবী, শিব চণ্ডীর কাহিনি, সামাজিক কাহিনী ইত্যাদির আলোচনা। এছাড়া আলোচিত হয়েছে আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রতিভূ স্বরূপ মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকবর্গ, সামাজিক শিল্প, গোষ্ঠীগত শিল্পকলা ও শিল্পীসমাজের কথা, মন্দির নির্মাণে জড়িত শিল্পী-সামাজের পরিচিতি ও বাসস্থান, প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি ও শিল্পকলা কৌশল, সমকালীন শিল্প ও সমাজব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়, নান্দনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত নির্মাণ সমূহ, শিল্পগুণসমৃদ্ধ মূর্তি সমূহের প্রতিষ্ঠা ও অবস্থানগত মূল্য প্রভৃতি বিষয়। বাংলার অন্ত্যমধ্যযুগের মন্দির-স্থাপত্যেরপর্যালোচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটির মূল্য সত্যিই অপরিসীম। এই গ্রন্থে লেখক টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য

সম্পর্কিত নানা দিক নিয়ে সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এই গ্রন্থে বিশ্লেষণের চেয়ে বিবরণের আধিক্যই বেশি। টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত হলেও কিছু কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েও লেখক এখানে আলোচনা করেছেন।

ভারতের শিল্প সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা: বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত গবেষক ও লোকসংস্কৃতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত ২০০০ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে টেরাকোটা শিল্প জগতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ষোড়শ সপ্তদশ শতকে মল্লভূমের প্রেক্ষাপট, বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মল্লভূমের সাংস্কৃতির ধর্মীয় চর্চা চিন্তায় নবদ্বীপের প্রভাব, বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটার কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ বৈচিত্র্য, বিষ্ণুপুরের মন্দির ভাস্কর্যে কবিচন্দ্রের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। বাংলা তথা বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের আলোচনায় এই গ্রন্থটি একটি আকর গ্রন্থ হিসাবে কাজ করে।

বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা আলোচনা করার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য একটি আকর গ্রন্থ। বিশেষ করে ষোড়শ সপ্তদশ শতকের মল্লভূমের সাংস্কৃতিক ধর্মীয় চর্চা চিন্তায় নবদ্বীপের প্রভাব বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটায় কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা গ্রন্থটিকে সত্যিই আলাদা মাত্রা প্রদান করেছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের মন্দিরের গঠন এবং কৃষ্ণলীলা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা তুলনায় কম করা হয়েছে।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির: আখ্যান ও অলংকরণ: শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু লিখিত এই গ্রন্থটি ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের মন্দির ও বাংলার মন্দির প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে কৃষ্ণকথা, চৈতন্যকথা, রামকথা, বিভিন্ন দেবী প্রসঙ্গ, মন্দিরে অন্যান্য পৌরাণিক প্রসঙ্গে, মন্দির অলংকরণে সামাজিক চিত্র ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এই গ্রন্থটিও অবশ্যই বাংলার টেরাকোটা মন্দির চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের আখ্যান ও অলংকরণের আলোচনায় এই গ্রন্থ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এছাড়া ভারতবর্ষ ও বাংলার বিভিন্ন টেরাকোটার মন্দির নিয়েও আলোচনা রয়েছে। তবে এই গ্রন্থে বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের গঠনরীতি ও অলংকরণ শৈলী নিয়ে সেভাবে আলোচনা করা হয়নি।

বাংলার মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: পুরাতত্ত্ববিদ ও লোকসংস্কৃতিবিদ প্রণব রায় ১৯৯৮ সালে 'বাংলার মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ও আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে বাংলার আঞ্চলিক মন্দির-স্থাপত্যের রীতি, বিকাশ ধারা প্রকৃতি, মন্দির-স্থাপত্যের উদ্ভব ও ইসলামীয় ধর্মীয় স্থাপত্য, মন্দিরের অলংকরণ, বিভিন্ন জেলার মন্দির টেরাকোটার সমীক্ষা, মন্দির টেরাকোটায় রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক, লৌকিক ও সামাজিক চিত্র ইত্যাদি বিষয়। টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের চর্চার ক্ষেত্রে সত্যিই এ গ্রন্থ কৃতিত্বের দাবী রাখে। আলোচ্য গ্রন্থে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানান তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে বিভিন্ন জেলার মন্দিরের আলোচনা ও সমীক্ষা। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বিবরণের এতো বেশি আধিক্য রয়েছে যে বিশ্লেষণের জায়গাটি কমে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় স্থাপত্য: মন্দির ও মসজিদ: এই গ্রন্থটিও পশ্চিমবঙ্গের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁরাপদ সাঁতরা ১৯৯৮ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিতে বাংলার বিভিন্ন জেলার মন্দির-স্থাপত্যের গঠন রীতি, শৈলী, মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত আক্ষরিক অর্থ ও প্রতিশব্দ, নানা ধরণের নকশা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের মন্দির ও মসজিদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলেও মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণ শৈলী ও টেরাকোটা ফলকের বিষয় সম্পর্কে খানিকটা কম অলোচনা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির: শম্ভু ভট্টাচার্য রচিত এই গ্রন্থটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের প্রতিশব্দ ও আক্ষরিক অর্থ, বিভিন্ন জেলার মন্দির-স্থাপত্যের গঠনরীতি ও অলংকরণ শৈলী প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য আলোচনার ক্ষত্রে এই গ্রন্থটিরও যথেষ্ট গুরূত্ব রয়েছে। টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের প্রতিশব্দ ও আক্ষরিক অর্থ এবং বিভিন্ন জেলার মন্দিরের পরিচিয় ও পর্যালোচনা বেশ তথ্য সমৃদ্ধ। তবে গঠনরীতি, অলংকরণ, মোটিফ, ফলকের বিষয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে লেখক খুব একটা তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেননি। এই গ্রন্থটিও বিশ্লষণধর্মী না হয়ে বিবরণধর্মী হয়েছে।

বাংলার মন্দির: হিতেশরঞ্জন সান্যাল লিখিত এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রথমেই আলোচিত হয়েছে বাংলার কয়েকটি প্রাচীন মন্দির প্রসঙ্গ। এছাড়া আলোচিত হয়েছে মন্দির-স্থাপত্যের বিভিন্ন রীতির প্রসঙ্গ। মন্দির-স্থাপত্যের এই গঠন রীতির সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে। এছাড়া কোন কোন জেলায় কোন কোন রীতির মন্দির দেখা যায় সে সম্পর্কেও লেখক আলোচনা করেছেন।

মন্দির-স্থাপত্যের বিশ্লেষণের সঙ্গে মন্দিরের নান্দনিক দিকটিও এখানে সমান গুরূত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের গঠনরীতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও বেশ তথ্য সমৃদ্ধ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দির-স্থাপত্যের গঠন রীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অতি কথন ও অত্যাধিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লেখক মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণ শৈলী নিয়ে আলোচনা করলেও অলংকরণের বিষয় সম্পর্কে সেরকম কোন আলোচনা করেন নি।

বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে এ যাবৎ কাল যে সমস্ত চর্চা বা অনুশীলন হয়েছে তা কিন্তু সবগুলিই তথ্য সমৃদ্ধ ও গভীর অন্বেষণমূলক গবেষণাকর্ম নয়। বেশিরভাগ গ্রন্থেই বিশ্লেষণের চেয়ে বিবরণের আধিক্যই বেশি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, ইন্টারনেট ও অন্যন্যভাবে মুদ্রিত ও সংগৃহীত লিখিত দলিল ও নথিপত্রে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চার কয়েকটি ধারা লক্ষিত হয়, সেগুলি পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ:

১. আঞ্চলিক ইতিহাস অন্বেষণের সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ বিবরণ।
২. আঞ্চলিক শিল্প ইতিহাস অন্বেষণের সূত্রে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
৩. টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।
৪. কোন অঞ্চলের সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সেই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
৫. জেলা ভিত্তিক লোকসংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সেই জেলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
৬. গবেষণা প্রকল্প অনুসারে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের বিষয়ে নিবিড় মৌলিক গবেষণামূলক মনোগ্রাফ পরিচয় ও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ।
৭. বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকায় টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
৮. টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ে সাধারণ মানের উদ্দেশ্যহীন বিবরণমূলক গ্রন্থে পরিচয় ও বিবরণ।
৯. নির্দিষ্ট গবেষণা প্রকল্প অনুসারে প্রস্তুত গবেষণা প্রবন্ধে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ।
১০. বিভিন্ন ওয়েবসাইটে টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিবরণ প্রদান।

৪. বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চায় ব্যাক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ: প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে ভরপুর এই বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দান করেছে এখানকার অনন্য ও বৈচিত্র্যময় টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য। সঠিক সংরক্ষণের অভাবে ও প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের ফলে অনেক মন্দির ধ্বংসের পথে। কিন্তু আশার কথা এই যে বাংলার এই অমূল্য সম্পদ ও মহান কীর্তি সংস্কার, সংরক্ষণ ও পুর্ননির্মাণের জন্য নানান দেশী, বিদেশী প্রতিষ্ঠান এবং অনেক সহৃদয় ব্যাক্তি এগিয়ে এসেছেন। সরকারী ও বেসরকারী স্তরে যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলার এই টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য বিশ্বের ধর্মীয় ও পুরাতাত্ত্বিক মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। বাংলার অনেক স্থানের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য আজ National Heritage Site-র মর্যাদা লাভ করেছে।

বাংলার এই অপূর্ব সম্পদ টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য অর্থাৎ দেশীয় এই ঐতিহ্যকে বাঁচানোর জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্লানিং কমিশন, বিড়লা স্ট্রাষ্ট এবং নানান বিদেশী সংস্থা বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যাতে এই দেশীয় ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়ে না যায়। এইসব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলার বিভিন্ন স্থানের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপতগুলি সংরক্ষণ ও পুনর্নিমাণের চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি মন্দির সংরক্ষণ করেছে তবে দুঃখের কথা এই যে এই শতাধিক প্রাচীন টেরাকোটার মন্দিরগুলিকে সরকারী ও বেসরকারীভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না।
বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তিন ধরনের সক্রিয় উদ্যোগ দেখা যায়। উদ্যোগগুলি হল:

১. সরকারী উদ্যোগ: (ক) কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ ও (খ) রাজ্য সরকারের উদ্যোগ
২. বেসরকারী উদ্যোগ
৩. পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত উদ্যোগ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহায়তার ফলেই নানাভাবে মন্দিরগুলিকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনস্ত নানা সংস্থা মন্দির সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বাংলার নাগরিক সমাজ এ বিষয়ে সক্রিয় ও গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া পরিবারগতভাবেও মন্দিরগুলি সংস্করণের জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। কেননা এখানকার বেশ কিছু মন্দির এখনও পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে রয়েছে। কাজেই যে যে পরিবারের অধীনে যে সমস্ত মন্দির রয়েছে সেগুলি সংরক্ষণের জন্য সে সমস্ত পরিবারেরা সদস্যরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত স্থানের মন্দির-স্থাপত্য সংরক্ষণ করেছে সেইসব স্থানের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ক একটি করে মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে। ফলে সেই সব স্থানের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, গবেষক ও পর্যটকেরা সেই অঞ্চলের মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এছাড়া অনেক সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ামে টেরাকোটার নানান ফলকও সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া অনেক স্টেশন বা বাসস্ট্যান্ড স্থানীয় টেরাকোটা মন্দিরের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে, যা দেখে পর্যটকদের উৎসাহ বাড়ছে।

তবে সাধারণভাবে বলা যায় বাংলায় টেরাকোটা মন্দিরগুলি ভীষণভাবে অবহেলিত এবং ক্রমশ ধ্বংশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের দায়িত্ব এই অমূল্য পুরানিদর্শনগুলিকে অক্ষত রাখা। তাই টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে হলে মন্দির সংরক্ষণের যথাযথ প্রকল্প প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়িত করতে হবে।

৫. মূল্যায়ন: বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে সব টেরাকোটার মন্দিরগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলি বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাস জানার জন্য সত্যিই গুরূত্বপূর্ণ। বাংলার এই অমূল্য সম্পদ মন্দির টেরাকোটা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী পন্ডিত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানান চর্চা ও আলোচনা করেছেন এবং গবেষকরা এও বলেছেন বাংলার এই মহান

ঐতিহ্যকে কীভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। এই নিয়ে নানান গ্রন্থ পত্র, পত্রিকা, ই-মাধ্যম প্রভৃতিতেও বিস্তর লেখালেখিও হয়েছে। বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ড্যকূমেন্টেশনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। সঠিক বিচারে দেখা যায় বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের যথেষ্ট গুরূত্ব রয়েছে। লোকঐতিহ্যের বিচিত্রধারা এখানে সজীবভাবে বহমান। তবে এই ঐতিহ্য সময় পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই অমূল্য সম্পদগুলি রক্ষাণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে- যা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। পুরাতত্ত্ব, পর্যটন ও লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি পরিদর্শন করলে আমরা, যে সময় বা কালে মন্দির-স্থাপত্যগুলি নির্মিত হয়েছে সে সময়ের সামাজিক, ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারি। তাছাড়া তখনকার দিনের শিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের টেরাকোটার ফলক নির্মাণ ও প্রতিস্থাপনের নৈপূণ্যতাও লক্ষ্য করি। বাংলার টেরাকোটা মন্দিরগুলি আজও অতীত ইতিহাস এবং পুরাবস্তুর সাক্ষী বহন করে চলেছে। পর্যটনের ক্ষেত্রেও বাংলার টেরাকোটা মন্দিরগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে টেরাকোটা মন্দির এবং ওই অঞ্চলের Heritage-র উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে এবং এইসূত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মানুষগুলির আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যদি এগোনো যায় তবে এবিষয়টির আরো শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব।

৬.উপসংহার: বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য প্রসঙ্গে যেসব দেশী-বিদেশী পর্যটক, পুরাতত্ত্ববিদ, সার্ভেয়ার আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগ্রহশালা এবং টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখকের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পুস্তিকাও বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মূল্যবান সম্পদ। এই সমস্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে আমরা যেমন জানতে পারি তেমনি দেখতে পাই সমকালীন সময়ের শিল্পীদের শিল্প কারিগরী কুশলতাকে। বাংলার এই টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী যুগ যুগ ধরে বহন করে নিয়ে চলেছে। এইসব মন্দির-স্থাপত্যগুলির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য এতো বিপুল ও বৈচিত্র্যময় যে ক্রমে ক্রমে তা বাংলার সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। তবে বর্তমানে অবহেলা ও অনাদরে এই স্থাপত্য-কীর্তিগুলিকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে স্থানীয় মানুষ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে বাংলার মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে গবেষণার অন্যতম ও প্রধান অগ্রদূত ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন অন্যতম প্রেরণাদাতা সত্যজিৎ রায়ের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> "David's indignation at the neglect of temples was as deep as his despair at some of the drastic and test less attempts at their presentation. Both David and I loved Bakreswar with its weird proliferation of moldy crumbling temples around the holy hot springs. I went there first in 1962. When I returned two years later, I found all the temples had in the meantime been given a coating of whitewash and painted pink. This, I was told, was preservation. I reported this to David. He went promptly to check, come back, drafted a sizzling letter of protest, went round on his bike calling on 'eminent intellectuals', and succeeded in persuading them to put their signatures to the letter"। [8]

কাজেই বাংলার এই অমূল্য ও মহান কীর্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই যথার্থভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষাণাবেক্ষণ হচ্ছে না। এখন আমাদের দরকার সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই ঐতিহ্যময় সম্পদগুলিকে সংরক্ষণ করা এবং এই মহান

কীর্তিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য সাধারণ মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে- তবেই বাংলার এই টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অমূল্য ও মহান কীর্তিগুলি সুরক্ষিত থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, প্রণব, বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ: ৬৩-৬৪।
২. দ্রষ্টব্য ১ নং পৃ: ৬৪।
৩. মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী ও অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা, মেদিনীপুর:বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫, ভূমিকাংশ।
৪. Preface by Satyajit Roy to ‘Brick Temples of Bengal From The Archives of David Mc Cutchion’, Ed. George Michell, Princeton University press, 1983, p, XII. (উধ্বৃত: ভট্টাচার্য, শম্ভু, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, কলকাতা: মনন প্রকাশন, ২০০৯, পৃ: ২-৩।)

গ্রন্থপঞ্জী:

আহমেদ, তোফায়েল, আমাদের প্রাচীন শিল্প (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।
কোঙার, গোপীকান্ত (সম্পাঃ), বর্ধমান সমগ্র (৪র্থ খণ্ড), কলকাতা: দে বুক ষ্টোর, ২০০২।
ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৮০।
ঘোষ, নীহার (ভাষান্তর শাশ্বতী ঘোষ ও গীতা নিয়োগী), বাংলার মন্দির শিলপ শৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১২।
ঘোষ, প্রদ্যৎ, বাংলার লোক্‌শিল্প, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
দাস, সুমাল্য (সম্পাঃ), অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্র অম্বিকা কালনা: ধর্মীয় ও পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস, কালনা: তটভূমি প্রকাশনী, ২০১২
দাস, সুমাল্য (সম্পাঃ), অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্র অম্বিকা কালনা: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কালনা: তটভূমি প্রকাশনী, ২০১২
দাশ, বিবেকানন্দ, কালনা মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত, কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।
মণ্ডল, সুজয়কুমার, লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, কলকাতা: নটনম্‌কোলকাতা, ২০১১।
মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী ও অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫।
মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, বাজের বদলে রাজ, বীরভূম: হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, ২০১১।
মুখোপাধ্যায়, গোপালদাস, নানকার মলুটী, বীরভূম: হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাস্টগড়া, ২০১২।
বন্দোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, বাঁকুড়ার মন্দির, কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৪।
বসু, শ্রীলা, ও অভ্র বসু, বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ, কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৫।
ভট্টার্চায্, শম্ভু, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, কলকাতা: মনন প্রকাশন, ২০০৯।
রায়, প্রণব, বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভার্স্কয, মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯৯।
চক্রবর্তী, রতনলাল, বাংলাদেশের মন্দির, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
হাসান, খন্দকার, মাহমুদুল, প্রাচীন বাংলার প্রত্নকীর্তি, ঢাকা: পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০১২।
সান্যাল, হিতেশরঞ্জণ, বাংলার মন্দির, কলকাতা: কারিগর প্রকাশনী, ২০১৫
সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৮।

Bandyopadhyay, Sukhamay, Temples of Birbhum, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1984.
Chowdhury, Saifuddin, Early Terracotta Figure of Bangladesh, Dhaka: Bangla Academy, 2000.
Dasgupta, Prodosh, Temple Terracotta of Bengal, New Delhi: Crafts Museum, 1971.
Deva, Krishna, Temples of North India, New Delhi: National Book Trust, 1986.
Dey, Mukul, Birbhum Terracotta's, New Delhi: Lalit Kala Academy, 1959.
George, Michell(ed.), Brick Temples of Bengal, New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1983.
Ghosh, Pika, Temple to Love Architecture and Devotion in Seventeenth Century Bengal, Bloomington: Indiana University Press, 2005.
Mc Cutchion, David J, Late Mediaeval Temples of Bengal Kolkata: The Asiatic Society, 1972.

অনুগবেষণা পত্র :

মুখার্জ্জী, তনয়া, মলুটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যঃ একটি পুরাতাত্ত্বিক অন্বেষণ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, ২০১২।